পাহাড়ের পাঁচালী

অমূল্য সেন

[আমাদের দেশে আরোহণের প্রথম যুগের নায়কদের একজন ছিলেন অমূল্য সেন। অভিযানের ক্ষেত্রে তাঁর অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসবে পেয়েছেন 'তেনজিং নোরগে পুরস্কার'। আজ অমূল্যদা আমাদের মধ্যে নেই, কিন্তু তাঁর কীর্তি, স্মৃতি, শিক্ষা আছে সঙ্গে। আছে মণিমানিক্যের মতো কিছু লেখা আরোহীর বাৎসরিক পত্রিকার পাতায়। ১৯৮৮-তে আরোহী সংগঠিত থেলু পর্বত অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অমূল্য সেন। তার অনেক পরে আমাদের রজতজয়ন্তী বর্ষে (২০০৭) যে বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল সেখানে তিনি লিখেছিলেন ঐ অভিযান পর্বের স্মৃতিকথা। এবারে সেটি পুনঃপ্রকাশিত হ'ল।]

রক্তবরণ হিমবাহ থেকে থেলু আভিমুখের গালি।

১৯৮৮ সাল। চৈত্রের এক সন্ধ্যায় আমার বাড়িতে হাজির সোনারপুর আরোহীর কয়েকজন। ওদের নেতা রাণা নাথ। সবাইকে আমি চিনতাম। সোনারপুর স্টেশন সংলগ্ন রাণার দোকান থেকে এগ-রোল, মাটন-রোল খেয়েছি অনেক। ও তখন একটু মাস্তানগোছের, বাকিদের অনেকে হাফমাস্তান। তবে ওদের সবারই হিমালয়ের প্রতি টান ছিল ভীষণ, এবং সেটা অকৃত্রিম। ওদের সঙ্গে আরও একজনের কথা উল্লেখ করতেই হয় – শ্যামল ভট্টাচার্য। খুব কর্মোদ্যোগী। তিনি তখন পশ্চিমবঙ্গ ইয়ুথ হোস্টেলের চেয়ারম্যান। মিলিটারি ফেরত শ্যামল সবার কাছে 'ভোলা মামা'।

রাণা, প্রশান্ত, শুভাশিসরা বলল, 'অমূল্যদা, পাহাড়ে তো অনেক ঘুরলাম। এবার একটা পিক-এক্সপিডিশন করতে চাই।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায়?' ওরা বলল, 'গাড়োয়ালের রক্তবরণ হিমবাহের ধারে, থেলু নামে একটা পিক।' বুঝলাম ওরা হোমওয়ার্ক করেই এসেছে।

১৯৬২ থেকে হিমালয়ে যাচ্ছি। চন্দ্রপর্বতে প্রথম সফল ভারতীয় অভিযানে (১৯৬৫) আমি ছিলাম। সেই অভিযানই তো আমার বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনার উৎস। গোমুখ, গঙ্গোত্রী, চতুরঙ্গী হিমবাহে পা রাখা। তারপরেও বহুবার গিয়েছি। হিমালয় যে পুরনো হয় না। তাছাড়া আমার একটা আদর্শগত দিক ছিল; যারা পাহাড়ে যায় তারা যদি আমাকে আমন্ত্রণ জানায়, আমি তাদের সহযাত্রী হয়ে যাব। এই নিয়ে অনেকে কটাক্ষ করেছে আমাকে, 'আপনাকে যেই ডাকে আপনি চলে যান।' হ্যাঁ, যাই। আর্থিক বা পারিবারিক সমস্যা

থাকা সত্ত্বেও যাই। জীবন-মৃত্যুর সীমানায় যারা খেলতে যায় তারা আমার প্রাণ। যাক, নিজের কথা থাক। বরং আরোহীর দামাল ছেলেদের কথা বলি।

২৫শে মে সোনারপুর স্টেশনে ফ্ল্যাগ-অফ হবে। পতাকা তুলে দেবেন তদানীন্তন জেলাশাসক অরশ ভট্টাচার্য। তিনি আবার সম্পর্কে ভোলা-মামা'র শ্যালক। ওদের আবদার ফেলতে পারিনি, সোনারপুরে যেতেই হয়েছিল। গিয়ে দেখি 'দাশু পাগলা'-দের আজব কাণ্ড! সারা প্ল্যাটফর্ম জুড়ে আমার নামে পোস্টার ... "আমাদের অভিযানের নেতা, বিগলিত করুণা জাহ্নবী যমুনা' সিনেমার নায়ক – অমূল্য সেন" ব্যাপার দেখে আমার মতো লজ্জাহীনেরও মাথা নত হয়ে যায়। এসব কী?

আসলে হিমালয়পথের প্রখ্যাত লেখক শঙ্কু মহারাজের কাহিনীনির্ভর প্রথম সিনেমার শুটিংয়ে আমি কিছুদিন গাইডের কাজ করেছিলাম। যমুনোত্রী পর্বের শুটিং সেরে উত্তরকাশিতে স্বনামখ্যাত পর্বতারোহী প্রাণেশ চক্রবর্তী আমার সাথী হয়েছিল। গঙ্গোত্রী থেকে গোমুখের পথে সিনেমার শেষাংশের শুটিং চলছে। প্রখ্যাত হীরেন নাগ পরিচালক। অনেক কলাকুশলী, নায়ক শুভেন্দু, নায়িকা মধুছন্দা; সঙ্গে শম্ভুদা, প্রাণেশ, আমি। ওই ছবির অন্তিম মুহূর্তে আমি দুমিনিটের একটি রোল করেছিলাম অনুরোধের ঠ্যালায়। একটা ডায়লগ মনে আছে, 'আঁধি আ রহী হ্যায়।' ব্যাস, ওইটুকুর জন্য আমি নাকি নায়ক! ভাবা যায়?

নির্দিষ্ট দিনে দেবতাত্মা হিমালয়ের পরিচিত পথ ধরে আমরা ভাগীরথীর উৎস ছাড়িয়ে গঙ্গোত্রী হিমবাহের ডানদিকে রক্তবরণ হিমবাহে ঢুকে পড়লাম। পৌঁছলাম আমাদের মূল শিবিরে, যেখানে থেলু নালা এসে জড়িয়ে ধরেছে রক্তবরণকে। এসব জায়গা আমার পরিচিত। প্রথম সফল সুদর্শন পর্বত অভিযান এই পথে হয়েছিল। কিন্তু আমার কাছে হিমালয়ের পথ চিরযৌবনা ঊর্বশীর মতো। এই ভালোবাসা পুরনো হয় না।

কর্মব্যস্ত হয়ে গেল মূল শিবির। আমার কথামতো প্রশান্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে একদল চলে গেল অগ্রবর্তী শিবিরের রাস্তা দেখতে। আর একদল শুভাশিসের নেতৃত্বে গেল অন্যদিকে। এভাবে ক'দিন ধরে অ্যাক্ল্যামেটাইজেশন পর্ব চলে। তারপর শুরু হয়ে গেল স্বপ্নের শিখরের দিকে যাওয়ার উদ্যোগ।

৫ জুন (১৯৮৮) – আমরা ন'জন সদস্য ক্যাম্প ওয়ানের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। দলে শ্যামল, প্রশান্ত, শুভাশিস, রাণা, সৌমেন, সঞ্জীব, দীপঙ্কর, আর এক শুভাশিস (রায়চৌধুরী) এবং আমি। সঙ্গে দুজন হ্যাপ ও এক সাধারণ মালবাহক। নিচের ক্যাম্পে রয়ে গেল শম্ভুনাথ ঘোষ ও রাজেন নাথ। থেলু নালার ওপরে সাদা মেঘের চাদর। কিছুক্ষণ পর শুরু হ'ল ঘন ঘন তুষারপাত। সামনে ক'ফুট আগের লোককে চিনতে পারছিলাম না। যা হোক, ওর মধ্যে কোনওক্রমে দুটো তাঁবু লাগানো গেল। বৈঠকে ঠিক করলাম, ছ'জনের দল যাবে শিখর অভিযানে। দায়িত্বে থাকবে প্রশান্ত। ওর কথা কম, কাজ বেশি।

৬ জুন – রাত সাড়ে তিনটেয় রওনা দেয় সামিট পার্টি। আকাশের অবস্থা বেশ খারাপ। তাঁর মধ্যেই ওরা এগিয়ে চলে। এদিকে আমি আর শ্যামল ঠিক করলাম, ওরা ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসার আগেই আমাদের ক্যাম্প গুটিয়ে ফেলতে হবে। কারণ ফিরে এসে তাঁবু দেখতে পেলে কেউই আর নিচে যেতে চাইবে না। আসলে আমাদের প্রায় প্রতিটি অভিযানেই দেখেছি, অর্থ-ই আমাদের একমাত্র বাধা। এই জন্য অভিযানে এসে আমরা ঠিকমতো সময় দিতে পারি না। আমার তো মনে হয়, অভিযানে এসে যদি টাকার চিন্তা না করতে হয়, তাহলে প্রতিটি অভিযানই সফল হবে, হবেই।

থাক সে কথা। আমাদের ছেলেরা ৬০০২ মিটারের থেলু শিখর আরোহণ করে ফিরেছে, বিকেলে। সবাই সুস্থ। কিন্তু ওরা আমাদের ক'জনকে খোলা তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হয়।

‘ক্যাম্পগুলো গেল কোথায়?’ – ওদের প্রশ্ন। কী আর বলি। ‘আমরা তাঁবু গুটিয়ে ফেলেছি। এখন ওগুলো তোল এবং বেসক্যাম্পে চল।’ ‘সেকী আজই! কেন?’ – আবার প্রশ্ন। উত্তর দিই, ‘নিচে চল, পয়সা বাঁচাও!’

১০ জুন – এবার সবাই একসাথে উত্তরকাশির ভাণ্ডারী হোটেলে। গোটা দল দারুণ কাজ করেছে। আরোহণ পর্বে প্রশান্ত মণ্ডলের নেতৃত্ব সত্যিই প্রশংশনীয়। শুভাশিস রায়চৌধুরী (তখন সম্পাদক) আরোহণের দিন দলের সঙ্গে তাল রাখতে না পেরে নিজেই বেস-ক্যাম্পে নেমে এসেছিল। এর নাম টিম-স্পিরিট। সবাস আরোহী, সাবাস! আর কী? ওখানেই ছোটখাট এক সেলিব্রেশন সারার সাথে সাথে পরের অভিযানের চিন্তা ভাবনাও শুরু হয়ে যায়।

হিমালয়ে কোনও শিখরই জয় করা যায় না। একটি শিখর দশবার আরোহণ করলেও এগারো-বারে ফেল করতে পারি। কিন্তু ধরা যাক, শিখরাভিযান সফল হ’ল, ওদিকে দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যু হ’ল। আমার কাছে সেই অভিযান ব্যর্থ। তাই আমি মনে করি, হাঁপিয়ে যাওয়ার চেয়ে থেমে থেমে যাওয়া ভালো। চিৎকার করে দাপাদাপি করার চাইতে গুনগুন করে গান গাওয়া ভালো!

রক্তবরণ প্রবেশের মুখে থেলু পর্বত, পিছনে বাঁয়ে সুদর্শন।